খেড়িয়া শবর আদিবাসী নারী কর্ম-আয়ের টুকরো কথা

পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামগুলি একদিন ঘুরে আসতে পারেন। দেখে আসতে পারেন জঙ্গল আর পাহাড়ের কোলে কোলে জেগে থাকা কুটিরগুলি। সেখানে দেখতে পাবেন আদিবাসীদের আপন জীবনছন্দ। জমির অভাব, কাজের অভাব থাকা সত্ত্বেও ওরা আজও হার মানেনি। আজও ওরা বেঁচে থাকে নিজেদের মতো। কারোর প্রতি ওদের কোনও অভিযোগ সেভাবে শোনা যাবে না। ওরা ওদের মতো কাজ করবে, গান ধরবে, জঙ্গলে যাবে। আর দেখতে পাবেন মহিলাদের কিছু কিছু হাতের কাজ। ওসব কাজ, রোজগারের একমাত্র উপায় ওদের কাছে। যেমন—

কাশি ঘাসের সোপিস তৈরী—

আদিবাসী মহিলার হাত কখনও কামাই যায় না। বন-জঙ্গলকে নির্ভর করে কোনওরকমে তারা জীবন চালিয়ে দেই। রান্না, ঘর পরিষ্কার, ঘর মেরামত, ছেলেপুলে সামলানোর পাশাপাশি হাতের কাজও করে থাকে তারা। যেমন পুরুলিয়ার খেড়িয়া শবর মহিলারা তৈরী করে নানরকম হাতের কাজ। জঙ্গল থেকে ওরা নিয়ে আসে কচি খেজুর পাতা। সংগ্রহ করে জঙ্গলের কাশি ঘাস। তারপর ওই পাতা ও ঘাস শুকিয়ে নেওয়া হয় কদিন। কয়েকটি (১৪-১৫) কাশি ঘাসকে মুষ্টিবদ্ধ করে তাকে জড়াতে থাকে কচি সাদা খেজুর পাতা দিয়ে। শুকনো কাশি ঘাস ও খেজুর পাতাকে জলে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। যাতে কাশি ঘাসের উপর খেজুর পাতা জড়ালে তা শক্ত হয়ে বসে যায়। ব্যবহার করা হয় ছাতার শিক থেকে তৈরী সুচ। ঘাস বুনতে বুনতে ঘাস বা পাতা শেষ হয়ে গেলে নতুন ঘাস ও পাতা যোগ করে ওই বুননের দৈর্ঘ্য বাড়ানো হয়। দিনের নানা সময় চলতে থাকে বুননের কাজ। কিছু পুরুষ এসব কাজ করলেও এটি মূলত মেয়েদের কাজ। স্কুলগামী মেয়ে থেকে ঘরের বৌ-শ্বাশুড়ীরা এটাকেই যেন পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে। কেননা ওদের নেই চাষযোগ্য জমি বা পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ। পুরুলিয়ার ১নং ব্লকের মালডি, অকড়বাইদ, বনডি গ্রামের মতো

বহু গ্রামে কাশি ঘাসের শৌখিন বস্তু তৈরী হয়। মেয়েরা তৈরী করে কাশি ঘাসের পেন স্ট্যান্ড, ফাইল ট্রে, কস্টার বক্স, টুপি, কচ্ছপ, প্যাঁচা, হাঁস ট্রে, চাঁদমালা। আরও অনেককিছু। সাবিত্রী শবর (৪৮), সুখোদা শবর (৩৯), ধনী শবর (৫৫), বৈশাখী শবর (৪২), অঞ্জনা শবর (৩৫) প্রমীলা শবর (৫৪) বা দশম শ্রেণীর ছাত্রী জ্যোৎস্না শবরদের প্রধান পেশাই এটা। ওরা সারা সপ্তাহ ধরে এসব শৌখিন বা ঘরসাজানো বস্তু তৈরী করে। যার কোনওটির দাম ৪০ টাকা, ৯০ টাকা, ২০০ টাকা বা তারও বেশী। আকার ও বানানোর সময় হিসাবে দাম সূচিত হয়। এভাবে সারা সপ্তাহ ধরে ওরা যতগুলি কাশি ঘাস ও খেজুর পাতার বস্তু বানায় তা বিক্রি করতে আসে রাজনোওয়াগড় গ্রামে। যেখানে আছে পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যান সমিতি। যার সভাপতিও একজন শবর মহিলা। নাম— রত্নাবলী শবর। শবর সমাজের উনিই দ্বিতীয় স্নাতক। সমিতিতে ওসব জিনিস বেচে ওরা সপ্তাহে আয় করে ৩০০-৪০০টাকা (গড়ে)। ওইটুকু টাকায় ওরা সংসারের খাই খরচ চালিয়ে নেয়। তাছাড়া আছে জঙ্গলের ফল, ফুল, শাক, আলু। যা প্রাকৃতিকভাবে পায় ওরা। ওতেই যেন ওরা খুশি। পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যান সমিতির সঙ্গে এরকম ১৭৪জন মহিলা শিল্পী এখনও যুক্ত। যারা ওসব হস্তশিল্প ঘরে বসে তৈরী করে। সমিতিতে (প্রতি মঙ্গলবার) বেচতে আসে। আর নিজেদের ভাষায় গান ধরে—

‘হস্তশিল্প বাঁধিতে আছে শবররা
মহাদেব বনই তবে হস্তশিল্প বাঁধিয়াছু
মালডি, অকরবাইদ মিলে বাঁধিয়াছু রে।’ এধরনের বহুগান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেছেন প্রশান্ত রক্ষিত মহাশয়, উনার ‘শবর লোকগান ও লোককথা' বইয়ে।

ঝাঁটা বাঁধা—

‘হাম বুঠু খেড়িয়া জাতিই
আইটকা কিড়ি দিন কাটু’

শবর ভাষার ওই গানের অর্থ— 'আমরা বটি খেড়িয়া জাতি। ঝাঁটা বিক্রি করে দিন কাটি।' ঘরদুয়ার সাফসুথরো করতে লাগে ঝাঁটা। ঝাড়ু মেরে ঘরদুয়ার থেকে ময়লা বিদায় করে মহিলারা। আবার কখনও কখনও ওই ঝাড়ু বা ঝাঁটা মেয়েরাই বানায়। সাধারণত খিলের ঝাঁটা, শরের ঝাঁটা, ফুলঝাড়ু আমরা দেখতে পাই। ব্যবহার করে থাকি। তবে আরও যে কতরকমের ঝাঁটা হয় তা পুরুলিয়া না গেলে জানা যাবে না। ওখানের নানা গ্রামের আদিবাসী মহিলা ও পুরুষরা ওসব বানায়। তবে এটা মূলত মহিলাদের কাজ। কেননা কাজটি সূক্ষ্ম ও সময়সাপেক্ষ। পুরুলিয়ার মানবাজারের আগে বিন্দুডি গ্রাম সংলগ্ন কতগুলি গ্রামের আদিবাসী মহিলারা প্রধানত এই ঝাঁটা বাঁধার কাজটি করে থাকে। যেমন বালকডি, কোনাপাড়া, হরিহরপুর, বনকানালি প্রভৃতি। আবার ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন পুরুলিয়ার রাজোগ্রাম, মৃগিচামী প্রভৃতি গ্রামের মহিলারা নিজেদের প্রয়োজনে তৈরী করে চিরুর ঝাঁটা। জঙ্গলের মোটা পাতার ঘাস চিরু। বেশ শক্ত ঘাস। চিরুর ঝাঁটা, চিরু ঘাস দিয়ে বানানো হয়। বানায় ঘরের মেয়েরা। আবার বালকডি হরিহরপুরের দিকে তৈরী হতে দেখা যায় খাজুর পাতার ঝাঁটা, বাঁশের ঝাঁটা, ঝুড়গুণ্ডা ঝাঁটা, খাড়াঙ ঝাঁটা। যাকে একপ্রকার হস্তশিল্পও বলা যেতে পারে। তবে তা এখনও প্রচারের আলোর বাইরে। ঝাঁটা বানানোর জন্য ব্যবহার করা হয় কাতু বা ধারালো লোহার ছোট্ট কাস্তে। আর খাজুর পাতাকে অতিসূক্ষ্ম করে চিঁড়তে লাগে সূঁচ। একটি বাঁশের কঞ্চির আগায় লাগিয়ে নেওয়া হয় দুটি বা তিনটি সূঁচ। দেবী শবর নামে অষ্টম শ্রেণীর বাচ্চা মেয়েটি ওই কঞ্চিবিদ্ধ সূঁচ নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে প্রায় মেশিনের মতো খাজুর পাতাগুলো চিঁড়ছিল। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ওই হাতের গতি দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। যাইহোক কয়েকটি খাজুর পাতা নেওয়া হয়। প্রতিটি ডাঁটসহ খাজুর পাতার মোটা ডাঁটটিকে চিঁড়ে দুভাগ করা হয়। সেই দ্বিখণ্ডিত ডাঁটগুলি আরও পাতলা করে চেঁড়া হয়। যাতে অনেকগুলি দ্বিখণ্ডিত ডাঁটকে একত্রিক করে বেঁধে, ঝাঁটা বানানো যায়। খাজুর পাতার শক্ত মোটা ডাঁটকে ছেলার জন্য কাতু ব্যবহার করা হয়। বাঁশের ঝাঁটার জন্য বাঁশকে সাইজ করে অতিসূক্ষ্ম করে চেঁড়া হয়। এক একটি বাঁশের টুকরোকে প্রায় নারকেল পাতার খিলের মতো তৈরী করা হয়। ওরকম অজস্র টুকরো নিয়ে তাদের সারিবদ্ধ করে বিশেষ কায়দায় বাঁধা হয়। যে বাঁধনকে বলা হয় বেণী। তারপর দীর্ঘ ওই বেণীকে জড়িয়ে জড়িয়ে তৈরী করা হয় বাঁশের ঝাঁটা। কখনও জঙ্গল থেকে প্রাপ্ত ঝুড়গুণ্ডা ঘাস বা খাড়াঙ নামক শক্ত-সোজা কাঠির মতো ঘাস দিয়ে বাঁধা হয় ঝুড়গুণ্ডা বা খাড়াঙ ঝাঁটা। বাড়ির ভিতর ঝাঁট দিতে কাজে লাগে খাজুর বা ঝুড়গুণ্ডা ঝাঁটা। গোয়ালঘর বা উঠোন ঝাঁট দিতে কাজে লাগে বাঁশ বা খাড়াঙ ঘাসের ঝাঁটা। শকুন্তলা শবর (৬০), সুমিত্রা শবর (৬০), কাজলী শবর (৪১), পার্বতী শবর (৬১), বাতাসী শবরদের (৩৫) জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় ওরা সারাদিন কাজ করলে প্রায় পাঁচটা খাজুর ঝাঁটা বেঁধে দিতে পারে। তবে বাঁশের ঝাঁটা বাঁধতে কয়েকদিন সময় লাগে। অপরপক্ষে ঝুড়গুণ্ডা বা খাড়াঙ ঘাস শুকিয়ে নিলে একদিনে দু-তিনটি ঝাঁটা বেঁধে দিতে পারে ওসব মহিলারা। ওসব ঝাঁটার শেষপ্রান্ত বা হাতলের জায়গার বাঁধন কিছুটা জটিল। আবার যা দৃষ্টিনন্দিত। মেয়েলি হাতের পরিপাটি খুঁজে পাওয়া যায় ওসব ঝাঁটার কাজে, গঠন-সাজে। যা

ওরা বংশানুক্রমে শিখে নেয়। এসব ঝাঁটা টেকেও অনেকদিন। তবে তার বাজারমূল্য সেরকম নয়। যেখানে একটা খাজুর/ঝুড়গুণ্ডা ঝাঁটা দশ টাকায় বা একটা বাঁশের ঝাঁটা ওরা পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করে বাজারে। কখনও বাড়ি বাড়ি ঘুরে। যা আয় হয় তাতে সংসার সেভাবে চলেনা। তবুও ওদের উপায় নেই। ওরা ওভাবেই জীবন চালায়। যার নাম ঝাঁটা, তার শিল্পীদের কে আর দেখতে যায় সেভাবে! জীবনের এক বুক আক্ষেপ নিয়ে পুরুলিয়ার কথ্যভাষার টানে বয়স্ক শকুন্তলা শবর যা শোনালেন তার অর্থ এই— 'সারাজীবন ঝাঁটা বাঁধা আর লোকের বাড়িতে কাজ করাই আমদের জীবন। আর কি!'

শালপাতা সেলাই—

পুরুলিয়ার জঙ্গলে শালগাছের অভাব নেই। যদিও তার সংখ্যা দিনদিন কমছে। বনবিভাগের উদ্যোগ থাকলেও তার অবস্থা শোচনীয়। আবার যারা শালগাছের পাতাকে নির্ভর করে জীবন কাটায় তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। আয় বলতে সেরকম কিছুই হয়না। তাছাড়া দিনদিন কমছে শালপাতার থালার ব্যবহার। তবুও ব্যাঙথুপি, কোনাপাড়া, হরিহরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও কিছু কিছু আদিবাসী মহিলা আছে যারা পাতা সেলাই করে। যাকে ওরা স্থানীয় ভাষায় 'পতরী সেলাই' বলে। যেমন কাজলী শবর (৫৮), সারথী শবর (৬১), সবিতা শবর (২৪), থাঁদু শবর (৬২), নিয়তী শবর (২৬), মমতা শবর (৩১)। জঙ্গল থেকে ওরা সংগ্রহ করে কাঁচা বা শুকনো শালপাতা। অবশ্য তা যেন পোঁকায় কাটা না হয়। তারপর বাঁশের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঠি, কখনও নিমকাঠি দিয়ে সেলাই করে শালপাতা। প্রথমে তিনটি পাতা নিয়ে বাঁশের কাঠি লাগানো হয়। অনেকটা কাঁথা সেলাইয়ের মতো। নিচে থেকে উপরে আবার উপর থেকে নিচে গাঁথা হয়

বাঁশের কাঠি। এভাবে পাতার সঙ্গে পাতা জোড়া লাগিয়ে, কাঠি সহযোগে ওরা মুহূর্তে সেলাই করে ফেলে পাতাগুলো। এগারো বা বারাটি পাতাকে গেঁথে গেঁথে গোলাকার আকার দেওয়া হয়। বুনন কাজের ক্ষিপ্রতাও চোখে লেগে থাকার মতো। পাতা সেলাই হয়ে গেলে তা দিন দুই রোদে শোকান হয়। তারপর শালপাতার থালাকে পরপর রেখে, চাপিয়ে দেওয়া হয় পাথর বা ভারি কোনও বস্তু। যাতে শালপাতাগুলো পাথরের চাপে টানটান ও সমান হয়। সারাদিনে নানা কাজের ফাঁকে ওসব মহিলারা একশো দেড়শটি শালপাতা সেলাই করে দিতে পারে। আর একশটা শালপাতা বিক্রি করে ওরা পায় ৬০টাকা মতো। বিয়েবাড়ি, অন্নপ্রাশন, মৃতবাড়ির কাজকর্ম হলে মানুষজন আসে শালপাতা কিনতে। কখনও নিয়ে যায় দোকানদাররা। শালপাতা সেলাই করে ওদের আয় আহামরি কিছুই হয়না। তবুও ওসব কাজ না করে ওদের গতি নেই। জঙ্গলই ওদের শেষ ভরসা। জঙ্গলই ওদের পেট।

বাবুই দড়ি পাকানো—

যা সাবাই ঘাস, তাই বাবুই ঘাস। সেই বাবুই ঘাসকে পাকিয়ে দড়ি বানানো হয় পুরুলিয়ার রাজোগ্রাম, মৃগীচামী, গোয়ালপাড়া, বুরুডি, ধাইতক্যা প্রভৃতি গ্রামের মেয়েরা। এটা মূলত মেয়েদের কাজ। সারা সপ্তাহ ধরে দড়ি পাকিয়ে তা বিক্রি করা হয় রাজোগ্রামের হাটে। হাট বসে সপ্তাহে একদিন, সোমবার। অন্যত্রও এই দড়ির হাট বসে। ওসব অঞ্চলের মেয়েরা সারাদিনে গড়ে

২০০ হাত দড়ি পাকিয়ে ফেলতে পারে। ওদের হাতের তালু এতটাই পটু। গল্প করতে করতে, একটা পায়ে বাবুই দড়ি চিপে ধরে দুই হাত উঁচুতে তুলে ওরা দড়ি পাকাই। বাবুই ঘাসকে সেসময় ভিজিয়ে নেওয়া হয়। তারপর পাকানো দড়িকে রাস্তায় লম্বা লম্বা করে বেঁধে শুকাতে দেওয়া হয়। বাবুই বা সাবাই ঘাস জঙ্গলে চাষ করা হয়। কেটে এনে দু তিন দিন শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকানো ঘাসকে বেছে, গোছা গোছা করে সাজিয়ে পাকানো হয় দড়ি। এক কেজি বাবুই দড়ি পাকিয়ে ওরা পায় ৩৫-৪০টাকা। সপ্তাহজুড়ে ওরা পাকাতে পারে আট-ন কেজি দড়ি। ওদের এই কর্মময় জীবনের কথা শোনাল শ্রীমতী তন্তুবায়— 'বছরে একবার চাষ হয়। চান খাবারের জন্য জল নাই, তাই কি করবো বাবুই পাকিয়ে জীবন চলে।' দশম শ্রেণীর ছাত্রী সঙ্গীতা তন্তুবায়, রুম্পা তন্তুবায়, ফুলমনি মাহাতো, ময়না তন্তুবায়, চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী অঙ্কিতা মাহাতো, একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী মামনি সিং-রা সবাই দড়ি পাকায় এখানে। দড়ি পাকায় পিপিন শবর, টুপান শবর, ফুলমনি শবর নামক মহিলারাও। মেয়েরাই এই কাজের মূল কারিগর। তাই পার্বতী মাহাতো যা বলল তার বাংলা রূপ হল— 'আমাদের জাত জিনিস বাবুই। আমাদের জঙ্গলে বাবুই বেশি। বাবুই বুনেই সংসারের তেল নুন হয় আমাদের।' ওদের কাজ, দড়ির বাজার মূল্য ও ওদের কথা শুনে বোঝা যায় কোন পরিস্থিতিতে ওরা আছে। জীবন সত্যি ওদের কাছে কষ্টের। তবুও ওরা বাঁচে। এসব অঞ্চলে কেও কেও চিরুর ঝাঁটা ও বাঁশের ঝাঁটা বানায়। আবার ফুলমনি মাহাতো, চঞ্চলা মাহাতো, কল্পনা মাহাতো, নমীতা তন্তুবায়, অসীমা তন্তুবায়, পিপিন শবব বা টুপান শবরের মতো ৪০-৫০ জন মেয়ে বাবুই দড়িকে সোপিস তৈরীর কাজে ব্যবহার করে। তাতে আয় হয় বেশী। বাবুই দড়ির উপর পাকে পাকে জড়ানো হয় খাজুর পাতা। গাছের কচি সাদা খাজুর পাতাকে সবুজ লাল নীল রঙ করা হয়। তারপর সাবাই ঘাসের গোছার উপর খাজুর পাতা জড়িয়ে জড়িয়ে ওসব মেয়েরা সোপিস তৈরী করে। তৈরী করে কস্টার বক্স, ট্রে, টুপি, বাস্কেট ইত্যাদি। যার দাম ২০০, ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। ওসব হতশিল্পকে নিয়ে যাওয়া হয় বিভিন্ন মেলায় বা পাঠিয়ে দেওয়া হয় চেন্নাই মুম্বাই কলকাতা নাগাল্যাণ্ডের বাজারে। এতে কিছুটা আয়ের মুখ ওরা দেখতে পায়। বাবুই ঘাসের হস্তশিল্পী ফুলমনি মাহাতোকে আমরা দেখেছিলাম ওসব শৌখিন জিনিস বানাতে। সে বলেছিল— 'বাবুই দড়ি পাকাতে পরিশ্রম বেশী, আয় কম। সোপিস বানাতে পরিশ্রম কম, আয় বেশী। তাই এসব জিনিস তৈরী করি আমরা।'

ড. শিবশঙ্কর পাল
সাহাপুর, তারাপীঠ
বীরভূম